لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ عِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ
مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿٤﴾ اِنَّا
سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ
اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٦﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا
طَوِيْلًا ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴿٨﴾
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾
وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾ وَ
ذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾ اِنَّ
لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ
تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ
اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

(২৮) যাতে আল্লাহ্ তাআলা জেনে নেন যে, রসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কি না। রসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান-গোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।

সূরা মুযযাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) হে বস্ত্রাবৃত, (২) রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে; (৩) অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (৫) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭) নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে। (১০) কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। (১২) নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। (১৩) গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪) যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তূপ। (১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রসূল।

আনষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে— وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا —অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ্ তাআলারই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলধিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কতসংখ্যক ফোঁটা বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষসমূহের পাত্রের সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। সমস্ত এলমে গায়ব যে আল্লাহ্ তাআলারই বিশেষ গুণ, আয়াতে একথা আবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপরোক্ত ব্যতিক্রম দেখে ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত না হয়।

এলমে-গায়বের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নমলের قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা জিন সমাপ্ত

সূরা মুযযাম্মিল

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ – مزمل এবং পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত مدثر শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রায় এক; অর্থাৎ, বস্ত্রাবৃত। উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্ত্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্ব প্রথম হেরা গিরি গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইক্‌রা সূরায় প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন, زملونی زملونی অর্থাৎ, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও।' এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে ''ফতরাতুল ওহী'' বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন ঃ একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একজায়গায় একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম ঃ আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আয়াত নাযিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও

অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।— (রূহুল-মা'আনী) এই বিশেষভঙ্গিতে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিধানাবলী ঃ مزمل ও مدثر শব্দদ্বয় থেকেই বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কোরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না। পাঞ্জেগানা নামায মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে বগভী (রহঃ) বলেন ঃ এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ, রাত্রির নামায রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয ছিল। এটা পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায কেবল ফরযই করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ, আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, এই আদেশ পালনার্থে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্যে যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মে'রাজের রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নত থেকে যায়। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। — (মাযহারী)

قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا - اَلَّيْلَ শব্দে সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ায় অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ, আপনি সমস্ত রাত্রি নামাযে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন। এটা اِلَّا قَلِيْلًا ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছুঅংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও এশার নামায ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেরও অনুমতি আছে, বেশীরও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা ফরয।

ترتيل قران এর অর্থ ঃ ترتيل এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা।— (মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্যে এই যে, দ্রুত কোরআন তেলাওয়াত করবেন না; বরং সহজভাবে এবং অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে উচ্চারণ করবেন।—(কুরতুবী) وَرَتِّلِ বলে রাত্রির নামাযে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায কেরাআত, তসবীহ, রুকু, সেজদা ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ্ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায অনেক লম্বা করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্রির নামাযে তিনি কিরূপে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এই প্রশ্নের জওয়াবে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কেরাআত অনুকরণ করে শোনান তাতে প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট ছিল।—(মাযহারী)

যথাসম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে, নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তাঁর কেরাআতের মত অন্য কারও কেরাআত আল্লাহ্ তাআলা শুনেন না।—(মাযহারী)

হযরত আলকামা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তেলাওয়াত করতে দেখে বললেন ঃ لقد رتل القران فداه ابى وامى অর্থাৎ, সে কোরআনে তরতীল করেছে; আমার পিতামাতা তার জন্য উৎসর্গ হোন। — (কুরতুবী)

তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তরতীল। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে ক্রন্দন করতে দেখে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا আয়াতের যে তরতীলের আদেশ করেছেন, এটাই সেই তরতীল।—(কুরতুবী)

قول ثقيل - اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (ভারী কালাম) বলে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআনে বর্ণিত হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবতঃ ভারী ও কঠিন। তবে যার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা সহজ করে দেন, তার কথা স্বতন্ত্র। কোরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত।—(বুখারী)

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কষ্টে অভ্যস্ত করার জন্যে তাহাজ্জুদের আদেশ দেয়া হয়েছে। রাত্রিকালে নিদ্রার প্রাবল্য এবং মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জেহাদ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোরআনে অবতীর্ণ কষ্টসাধ্য ও ভারী বিধি-বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ - ناشئة শব্দটি ধাতু। এর অর্থ রাত্রির নামাযের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রার পর নামাযের জন্যে গাত্রোত্থান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর শাব্দিক অর্থও রাত্রিতে নিদ্রার পর উঠে নামায পড়া। ইবনে কায়সান (রহঃ) বলেন ঃ শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করাকে نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়। ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন ঃ রাত্রির যে অংশতে কোন নামায পড়া হয়, তা نَاشِئَةَ الَّيْلِ এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবী মুলায়কা (রহঃ) এক

প্রশ্নের জওয়াবে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রহঃ)ও তাই বলেছেন।—(মাযহারী)

এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষতঃ এশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ও قيام الليل এর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী (রহঃ)বলেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও বুযুর্গগণ সর্বদাই এই নামায নিদ্রার পর শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উত্তম, ও অধিক বরকতের কারণ। তবে এশার নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا – وَطْئًا শব্দে দু'রকম কেরাআত আছে। প্রসিদ্ধ কেরাআতে ওয়াও এর উপর যবর এবং ত্বোয়া সাকিন করে অর্থ দলন করা, পিষ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে রাত্রির নামায প্রবৃত্তিদলনে খুবই সহায়ক; অর্থাৎ, এতে করে প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই কেরাআত অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয় কেরাআত হচ্ছে كتاب এর ওজনে وطاء এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থে ধাতু। لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ আয়াতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে নামাযের জন্যে গাত্রোত্থান করা অন্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ أَشَدُّ وَطْئًا এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ, রাত্রিবেলায় সাধারণতঃ কাজকর্ম ও হট্টগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শুনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

وَأَقْوَمُ শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ, রাত্রিবেলায় কোরআন তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য ও বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্যে ব্যাপক।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا – سبح শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা। এ কারণেই সাঁতার কাটাকেও سبح ও سباحة বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা দেয়া, প্রচার করা, মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত অথবা নিজের জীবিকার অন্বেষণে ঘোরাফেরা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। এটাও সবার জন্যে ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অন্যান্য সবাইকে অনেক কর্মব্যস্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাগ্রচিত্তে এবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্যে থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের এবাদতও হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ যেসব আলেম ও মাশায়েখ জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলার সামনে উপস্থিতি ও এবাদতে মশগুল হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলেমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোন সময় রাত্রিবেলায়ও উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনমাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষ্যও অনেক আলেম ও ফেকাহ্‌বিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا – تبتل এর শাব্দিক অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেয়ার পর এই আয়াতে এমন এক এবাদতের আদেশ দেয়া হয়েছে, যা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়; বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে।—(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; এতে কোন সময় অবহেলা ও অনবধানতাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেয়া হয়; অর্থাৎ, মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে ব্যাপৃত রেখে ইত্যাদি যে কোন প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ كان يذكر الله على كل حين অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতেন। এটাও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে পারে। কেননা, প্রস্রাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহ্‌কে স্মরন করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার। – (১) শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা এবং (২) আল্লাহ্‌র গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।—(মাওলানা থানভী)

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় আদেশ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا অর্থাৎ, আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিবিধানে ও এবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে এবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ تبتل এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা।—(মাযহারী) কিন্তু এই تبتل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رهبانية তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে لارهبانية فى الاسلام বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীয়তের পরিভাষায় رهبانية এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে এবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রুটি করে কার্যতঃ সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের উপর

কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেয়া। এ ধরণের সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পয়গম্বরগণের সুন্নত; বিশেষতঃ পয়গম্বরকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تبتل শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে-দ্বীনের ভাষায় এরই অপর নাম 'ইখলাস' ।—(মাযহারী)

জ্ঞাতব্য ঃ অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুফী বুযুর্গগণ সবার অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা বলেন ঃ আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিবারাত্রি মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্তর আছে - প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি স্তরই পর পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। (১) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ এবং (২) وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

এখানে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে স্মরণ করা, যাতে কখনও ত্রুটি ও শৈথল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সুফী-বুযুর্গগণের পরিভাষায় وصول الى الله আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লেখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহ্‌র পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার জন্যে স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (রহঃ) উপরোক্ত দু'টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ-

ইসমে যাতের যিকর অর্থাৎ, বার বার 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' বলাও এবাদত ঃ আয়াতে ইসম শব্দ উল্লেখ করে وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলা হয়েছে এবং وَاذْكُرْ رَبَّكَ বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসমে যাত অর্থাৎ, আল্লাহ্ বার বার উচ্চারণ করাও আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য। — (মাযহারী) কোন কোন আলেম একে বিদআত বলেছেন। আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا যাকে কোন কাজ সোপর্দ করা হয়, অভিধানে তাকে وكيل বলা হয়। কাজেই فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কারখী (রহঃ) বলেন ঃ সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সুলুক তথা আল্লাহ্‌র পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে (১) রাত্রিবেলায় আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে নির্জনে গমন, (২) কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, (৩) সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ (৪) সৃষ্টির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং (৫) তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার গুণ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালনকর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিম্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তাঁর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ইমাম কারখী (রহঃ)-এর উক্তিমতে এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রদত্ত ষষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ, মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহ্‌র পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে,প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই নির্যাতন ও গালি-গালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনাও করবে না। সূফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিলীন করা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا এর শাব্দিক অর্থ বিষণ্ন ও দুঃখিত মনে কোনকিছুকে ত্যাগ করা। অর্থাৎ, মিথ্যারোপকারী কাফেররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে যেয়ে هَجْرًا جَمِيلًا শব্দ যোগ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আপনার উচ্চ পদমর্যাদার খাতিরে আপনি কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখেও তাদেরকে মন্দ বলবেন না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ পরবর্তীতে অবতীর্ণ জেহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটা হুমকি, শাস্তি ও জেহাদের পরিপন্থী নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জেহাদে যে শাস্তির হুমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জেহাদ কোন প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশতঃ করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থী হবে। বরং জেহাদ বিশেষ খোদায়ী আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সান্ত্বনার জন্যে কাফেরদের পরকালীন আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا এর মর্ম তাই। এতে কাফেরদেরকে أُولِي النَّعْمَةِ বলা হয়েছে। نعمة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মুমিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে انكال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে ذَا غُصَّةٍ এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ, যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য যরী ও যাক্কুমের অবস্থা তাই হবে।

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾
فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِيْبًا ﴿١٧﴾ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾ اِنَّ
هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾
اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ
نِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَاللّٰهُ
يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَلِمَ اَنْ
سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا
وَّاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

(১৬) অতঃপর ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (১৭) অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ? (১৮) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে পথ অবলম্বন করুক। (২০) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবাদতের জন্যে দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দু' তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জেহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাতে আগুনের কাঁটা থাকবে ; যা গলায় আটকে যাবে। – (নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু) শেষে বলা হয়েছে ঃ وَعَذَابًا اَلِيْمًا নির্দিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক কঠোরতা ও অকল্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতঃপর কেয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ঃ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ এরপর কাফেরদের ফেরাউন ও হযরত মূসার কাহিনী শুনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফেরাউন পয়গম্বর মূসা (আঃ)-কে মিথ্যারোপ করে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমরাও মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমনি ধরনের আযাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আযাব না আসলেও কেয়ামতের সেই দিনের আযাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে। বাহ্যতঃ এতে কেয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিবৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা দিবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারও মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালক ও বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে।—(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তাহাজ্জুদ আর ফরয নয় ঃ সূরার শুরুতে قُمِ الَّيْلَ বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই নামায অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করে এই ফরয আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই এবাদত এবং দিনের বেলায় দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই মেহনত মজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের পদযুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ্ তাআলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের এবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান। এর প্রতি اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এর চেয়ে ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহ্র জ্ঞান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে দেয়া হল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেবল দীর্ঘ নামায রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামায পূর্ববৎ ফরয রয়ে গেছে। অতঃপর মে'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হল, তখন তাহাজ্জুদের নামায আর ফরয রইল না।

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ – احصاء শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা কররত পারবে না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ্ তাআলা

রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই নামাযে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা, তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাযে মশগুল হয়ে বার বার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও খুশু-খুযুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে احصاء শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি নামায পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন হাদীসে আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, من احصاها دخل الجنة অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

تَابَ عَلَيْكُمْ - توبة শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে ঃ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায, যা এখন ফরযের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে যতটুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্যে নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, ফরয নামায পাঁচটি যা মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায এক বছর পর্যন্ত ফরয থাকা কালেই মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সূরার শেষের وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াতে পাঞ্জেগানা ফরয নামায বোঝানো যেতে পারে।—(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

এমনিভাবে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ বাক্যে ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে-কাসীর বলেন ঃ যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে। — রূহুল-মা'আনীও তাই বলেছে।

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহ্‌কে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা ধনীদের সেরা ধনী; তাঁকে দেয়া ঋণ কখনও মারা যাবে না—অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনেক কিছু দেয়া, মেহমানদের জন্যে ব্যয় করা, আলেম ও সাধু-পুরুষদের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ বাক্যে এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ অর্থাৎ, তোমরা জীবদ্দশায় যে যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়্যত করে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ, মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা স্বাধীন ; তারা ওসীয়্যত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক এবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামায-রোযা ইত্যাদিও দাখিল।

সূরা মুয্যাম্মিল সমাপ্ত